আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা: শিক্ষা দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধতা

এক।।

শিক্ষা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া -- দর্শন ,অনুভব ও উপলব্ধির সমন্বিত রূপ। মানুষের অসীম জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্তির প্রচেষ্টা থেকেই শিক্ষার যাত্রা; ক্রমান্বয়ে বিদগ্ধ গুরুকে কেন্দ্র করে শিক্ষা লাভ করলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। ব্যক্তি উদ্যোগকে ছাড়িয়ে শিক্ষা বিকশিত হতে থাকলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। ভারতীয় উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা মূলত ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতেই। শাসকগোষ্ঠী শাসন কার্য পরিচালনার জন্য কিছু কর্মী তৈরি এবং শাসিত জনগোষ্ঠির সাথে যোগাযোগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন ।যদিও রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উইলিয়াম কেরি ও ডিরোজিওর মতো মনীষীদের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা হয়ে উঠেছিলো আমাদের আত্মানুসন্ধানের পাথেয়। ইতিহাসের নানা চড়াই-উতরাইয়ে পূর্ব বাংলার প্রাকৃত জনগোষ্ঠী খুঁজে পেল রক্তে ভেজা পলল ভূমি বাংলাদেশ।

কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক অতিক্রান্ত হলেও সে খুঁজে পেয়েছে কি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নযোগ্য ও যথার্থ শিক্ষানীতি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি আমরা খোঁজার চেষ্টা করব শিক্ষার কালোত্তীর্ণ দার্শনিক ধারা সমূহের কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়।

ইউরোপে সামন্ত সমাজে শিক্ষার অধিকার ছিলো যাজকশ্রেণি এবং অধিপতিশীল শ্রেণির মধ্যে। ভারতে বর্ণপ্রথা প্রচলনের মধ্য দিয়ে বেদ ও দর্শন শিক্ষা কেবল বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিদ্যা উচ্চবর্ণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। শূদ্র তথা বিপুল শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিদ্যায়তনিক শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিলো। পৃথিবীর দেশে দেশে গণশিক্ষা প্রচলনের ইতিহাস বলতে গেলে সাম্প্রতিক। একদিকে পুঁজিবাদের বিকাশের স্বার্থে গণশিক্ষার প্রচলন ঘটেছে, অন্যদিকে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার দ্বার আজও পৃথিবীব্যাপী ধনিক শ্রেণির হাতেই কুক্ষিগত। এই পরিসরের মধ্যেই শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ পর্যন্ত হয়েছে এবং শিক্ষার লক্ষ্য, তার আধেয় এবং প্রয়োগের প্রকৃতিকে শিক্ষার দর্শন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, কোন পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন, শিক্ষা প্রদানের পথ-পদ্ধতি কেমন হবে, এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে শিক্ষাদর্শন। কেবল বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানে নয়, আইনি, সরকারি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যারা অর্থ বরাদ্দ করে, চাহিদা তৈরি করে এবং সেবা প্রদান করে- এসব প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাদর্শন নির্মাণের অপরিহার্য অংশীদার। বলে নেওয়া দরকার, এই শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাদর্শন বিপুলভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবাধীন- সক্রেটিস, অ্যারিস্টোটল, প্লেটোসহ গ্রিসের অন্যান্য দার্শনিক এবং ইউরোপীয় আলোকায়নপর্বের যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির পথ অতিক্রমন করে বর্তমান দিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আর শিক্ষার দর্শন হিসেবে ৭টি ধারা মান্যতা পেয়েছে:

১। অপরিহার্যতাবাদ (Essentialism)- এই ধারায় জ্ঞান অর্জনের জন্য শেখানো হয় দক্ষতা এবং মূল্যবোধ। একেবারে মৌলিক দক্ষতা যেমন সাক্ষরতা, সংখ্যা জ্ঞান এবং যথাযথ ব্যবহার ও মূল্যবোধ সম্পর্কে শেখানোর ওপর জোর দেওয়া হয়।

২। প্রগতিবাদ (Progressivism)- এই ধারায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আলোকিত হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া এবং সমাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩। স্থায়িত্ববাদ (Perennialism)- শিক্ষার্থীদের ভেতর যুক্তিবাদী এবং নৈতিক শিক্ষার বিকাশ গঠনের ওপর জোর দেয়া হয় , যা হবে স্থায়ী ও কালোত্তীর্ণ ।

৪। অস্তিত্ববাদ (Existentialism)- চিন্তা ও সক্রিয়তার জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন ও দায়িত্ব গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫। আচরণবাদ (Behaviourism)- শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন শিক্ষার একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত।

৬। ভাষাগত দর্শন (Linguistic Philosophy)- যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশই ভাষা দর্শনের মুখ্য ভিত্তি।

৭। গঠনবাদ (Constructivism)- শিক্ষার্থীদের স্বপ্রণোদিত এবং স্বাধীন করে গড়ে তোলাই এই ধারার মূল উদ্দেশ্য।

ইউটোপিয়ানরা মনে করেন এবং প্রচার করেন, এইসব দর্শন ধারণ করলে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং ঊর্ধ্বমুখী জ্ঞানসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ দর্শনের এই তালিকা থেকে যে উদ্বেগটি উঠে আসে, তা হলো, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সাদৃশ্যকরণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সকলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এক অনুগত শ্রেণি তৈরি করা? প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা কি তবে, জর্জ অরওয়েলের বক্তব্য অনুযায়ী, শাসক অভিজাতের জন্য প্রয়োজনীয় খড়বিচালি তৈরি করা? সমস্যা তৈরি হয় ফের এসব দর্শন কীভাবে প্রয়োগ হয়, তার উপর। চারটি বিষয়কে মূলত দেখা হয় শিক্ষাদর্শন বোঝার জন্য: শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা এবং ন্যায্যতা, পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন এবং অর্থায়ন। এই চারের আলোকেই আমাদের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাদর্শন।

দুই।।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে অজানা প্রকৃতির কোলে অস্তিত্বের স্বার্থেই সামাজিক সহযোগিতার শর্ত পূরণের জন্য এই সমাজের শিক্ষাদর্শন ছিলো সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সামাজিক সংহতিমূলক। অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যা প্রজন্মান্তরে প্রবহমান রাখাই ছিলো মূল দর্শন। কিন্তু দাস সমাজে এসে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে গেছে। মালিকের স্বার্থে দাসদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য নিশ্চিত করাই হয়ে উঠলো সমাজের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শন। এই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শনের বিস্তৃত রুপরেখা পাওয়া যায় পাশ্চাত্যে গ্রীক দার্শনিক, মধ্যপ্রাচ্যে হিব্রু ধর্মযাজক, ভারতে বেদ-উপনিষদ প্রণেতা এবং দূরপ্রাচ্যে লাওৎসে, কনফুসিয়াস প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাচেতনায়। দেশ এবং সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও এসব শিক্ষাদর্শনের মূল সাদৃশ্যের জায়গাটি ছিলো শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এবং সেই সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য শ্রমজীবী মানুষকে পরলোকের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি-লোভ-মোহ-নির্বাণ-স্বর্গরাজ্য-বেহেস্তের স্তোক দিয়ে ইহকালের শোষণকে ভুলিয়ে রাখা, এবং সম্পদসহ শিক্ষা-সংস্কৃতি-আইন-ক্ষমতা জাতীয় সকল ইহজাগতিক প্রাপ্তি মালিকদের জন্য নিশ্চিত করা। তারপর সময়ের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী বদলে গেছে অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা, তার সাথে খাপ খাইয়ে বদলে গেছে মানুষের জীবনধারা এবং জীবনধারার একান্ত অনুষঙ্গ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে বস্তু জগতের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানকে বৃহত্তর মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোর দক্ষতা , ব্যক্তির ভেতরের সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞানী ,কর্মক্ষম, সামাজিক, সৃজনশীল মানুষ তৈরি ,যাকে আমরা বলি মানবসম্পদ।

এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করি।আমরা লক্ষ করি,প্রাচীন দাসসমাজের শিক্ষাদর্শন আরো জোরদার হয়ে সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের হাত ধরে আমাদের শিক্ষার সুযোগ যেন আবার কুক্ষিগত অনেকটা অধিপতিশ্রেণির হাতেই।

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল দর্শন হলো ব্যক্তির ভিতরে মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ, আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধন। প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সুকুমারবৃত্তির জাগরণ ও সামাজিকীকরণ। মাধ্যমিক শিক্ষায় এর সাথে যুক্ত হয় নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ।উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হলো গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতা। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া গুলো সুচিহ্নিত ,সুনিয়ন্ত্রিত নয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আমাদের মূল ধারার শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ,কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ।

ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না ।বর্তমান শিক্ষানীতিতে একমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলেও ইংরেজি মাধ্যম, কওমি সহ বিবিধ মাদ্রাসা শিক্ষা ও বিচিত্র ধরনের কিন্ডারগার্টেন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার একটি ব্যাপক অংশের শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অপরিকল্পিত ,স্বেচ্ছাচারী , মানহীন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ভার। এই ভার শিক্ষার্থীর সুকুমারবৃত্তি বিকাশের পরিবর্তে সেগুলোকে ধ্বংস করছে ক্রমান্বয়ে ; কেড়ে নিচ্ছে শিশুর সুন্দর শৈশব।

বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেখানে শিশুর সৃজনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানোর কথা , সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর মনে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষা ভীতি। বাড়তি উপদ্রপ হিসেবে এর সাথে

যুক্ত হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসের মতো ভয়াবহ কর্মকাণ্ড ,যা শিক্ষার্থীদের মনে জাগ্রত করে আত্মবিশ্বাসহীনতা, তাকে পরিচিত করে অনৈতিক অন্ধকার দুনিয়ার সাথে। আমাদের এখন ভাবনার সময় এসেছে, ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার সুযোগ কি কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে না ধনিকশ্রেণির হাতে?

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, বিতর্ক, সংগীত, আবৃত্তিচর্চা সহ বিচিত্র সৃষ্টিশীল সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গণহারে মানহীন উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার মাধ্যমে আমরা কি তৈরি করছি না একটি কর্মহীন ,আত্মবিশ্বাসহীন যুব সমাজ? তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যার ভারে টালমাটাল অনুন্নত দেশ হিসেবে আমাদের ব্যাপক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য কর্মমুখী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই ।

তিন।।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ড.বেঞ্জামিন ব্লুম প্রবর্তিত Bloom's taxonomy of educational objective তত্ত্বে শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে -

১। জ্ঞানমূলক(cognitive),

২। অনুভূতিমূলক (affective),

৩। মনোদৈহিক (psychomotor)

পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপযুক্ত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়ন বা অর্জন সম্ভব।

Bloom's Taxonomy 'র উপরিউক্ত Domain (শ্রেণি)গুলোকে আবার বিভিন্ন Co-domain(উপশ্রেণি)তে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন: জ্ঞান মূলক স্তরকে ৬ টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :জ্ঞান ,অনুধাবন ,প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ,সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ।

শিক্ষাবিজ্ঞানী অ্যান্ডারসন কিছুটা পরিবর্তন করে জ্ঞানমূলক স্তরকে চিন্তন দক্ষতা অনুসারে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন :

১।জ্ঞান,

২।অনুধাবন,

৩।প্রয়োগ ,

৪।বিশ্লেষণ ,

৫।মূল্যায়ন ও

৬। সৃজন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বর্তমানে কাঠামোভিত্তিক বা সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপরিউক্ত দক্ষতা সমূহ যাচাই করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্তরে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ,মূল্যায়ন ও সৃজন ভিত্তিক গবেষণাধর্মী কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো নয় ।আমাদের উচ্চ শিক্ষা দানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত :

১।পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ,

২।বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও

৩।কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপর্যস্ত লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র-শিক্ষকের রাজনৈতিক দৌরাত্ম্যে ।আবরার ফাহাদের মতো মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই কলুষিত রাজনীতির বলি। সাম্প্রতিক করোনা সংকটের অব্যবহিত পূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ,বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নেতিবাচক কর্মকান্ড এবং তৎপরবর্তী শিক্ষক-শিক্ষার্থী আন্দোলনে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাওয়াও কলুষিত রাজনীতির ফল ।

আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করা শ'খানেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগই পরিচালিত হচ্ছে একান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে মানহীন শিক্ষার অভিযোগ ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে কলুষিত ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা।
যার ভোগান্তির শিকার লক্ষ লক্ষ সাধারণ শিক্ষার্থী। বেসরকারি স্কুল কলেজগুলোতে রাজনৈতিক মেরুকরণের নতুন অভিশাপ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ;পরিচালনা পর্ষদ গঠন থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডেই প্রবাহিত এক কলুষিত রাজনৈতিক ও আধিপত্যবাদী স্রোতধারা। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেখানে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কথা সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক ও আধিপত্যবাদী বিবেচনা।

চার।।
সর্বত্র চলছে শিক্ষার গুণগত মানকে উপেক্ষা করে পাশের হার বৃদ্ধির এক লোক দেখানো প্রতিযোগিতা। শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে নোট, গাইড, কোচিং। শুধু ফলাফল নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের শিক্ষার্থী নয়, পরীক্ষার্থী হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এই অবস্থায় বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে চালু হলো দুটি বড় পরিবর্তন । শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ক্লাস পরীক্ষা ও বিবিধ প্রায়োগিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সিংহভাগ মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার পরিবর্তে একমুখী বা অভিন্ন পাঠ্যক্রম। বিশ্লেষকরা বলেছেন, এই পদ্ধতি চালু করার আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে জনবল তৈরি করা, পরিপূরক নিয়ম ও অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে নোট-গাইডমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু হবে- সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাদের। পাশাপাশি শিক্ষকদের হাতে থাকা নম্বর নিয়ে স্বজনপ্রীতির আশঙ্কাও রয়েছে। এসব বিষয় যদি নিরসন করা যায়; তাহলে নতুন পাঠ্যক্রম থেকে ভালো ফলের আশা করছেন তারা।
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমে এর শুরুর ইতিহাস নিয়ে দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় গঠিত কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্তের আলোকে আজকের এ উচ্চ-শিক্ষাব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়েছে। এর পেছনে যেমন নানা শাসকগোষ্ঠী, দল ও ব্যক্তির যুগপৎ প্রচেষ্টা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিদেশি শিক্ষার প্রবেশ ও অনুপ্রবেশ। দেশীয় শিক্ষাব্যস্থায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ১৯৭৪ সালে, 'কুদরাত-এ-খুদা' তথা জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে। সদ্যোজাত স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। এ প্রতিবেদনেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় চার বছর মেয়াদি সম্মিলিত ডিগ্রি কোর্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স চালুসহ নানা প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়; যা পরে বাস্তবায়ন হয়। শুধু তাই নয়, এ কমিশনের মাধ্যমেই প্রতি বৃহত্তর জেলা, বিভাগীয় শহর এবং রাজধানীতে একটি করে কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের কথা বলা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (১৯৭৮), মজিদ খান শিক্ষা কমিশন (১৯৮৩), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৭), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ ও অন্যান্য এবং 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চ-শিক্ষাবস্থায় নানাভাবে পরিবর্তন এসেছে।
তবে এতকিছুর পরও আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যিকার অর্থেই কি আমাদের উচ্চস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সব পরিবর্তন ইতিবাচক?
উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রায় সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে গিয়ে এর গুণগত মানের বিষয়টি হয়ে গেছে একান্তই গৌন । নির্দিষ্ট পেশাজীবী শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষার সুযোগ রেখে অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করলে তা হবে যথার্থ ,যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত ।অন্যথায় উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্বের মাধ্যমে সৃষ্টি

হবে আরও বহুরকম সামাজিক সংকট, ভেঙ্গে পড়বে সামাজিক ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা। রাষ্ট্রও এড়াতে পারবে না এর দায়।দেশ ও জাতি গঠনের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার বিশ্বে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়ার জন্য শক্তিশালী মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে, যেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

এতে শিল্প-প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হবে এবং শিক্ষার্থীরাও স্বল্প সময়ে কর্মজীবন শুরু করে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ফলে সবাই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেও চাইবে না, শুধু গবেষণায় আগ্রহী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষায় আসবে। এতে উচ্চশিক্ষার মানও বাড়বে।

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর ব্যবহারিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষাকে অনেকদিনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। ওই পদক্ষেপের কারণেই হয়তো তারা আজকে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি চর্চার মোড়লে পরিণত হতে চলেছে। দেশের দ্রুত উন্নয়ন ও স্বাবলম্বিতা অর্জনে আমাদের সবার শিক্ষা ভাবনাও তো এ রকমই হওয়া উচিত।

পাঁচ।।

শিক্ষকদের কল্যাণধর্মী স্নেহ ছায়া বা পরিচর্যায় বিকশিত হয় শিক্ষার্থীর জীবন। তাই শিক্ষকদের আর্থসামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে সর্বাগ্রে । সম্প্রতি প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক স্কুল ও একটি কলেজ সরকারিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি মহৎ উদ্যোগ ।কিন্তু গণ সরকারিকরণের সাথে সাথেই সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা । দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও আধিপত্যবাদী বিবেচনায় সেখানে যে পরিচালনা পর্ষদ এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেছে তার মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে তৈরি হয়েছে কলুষিত রাজনীতির এক অলিখিত যোগসূত্র ।একজন সরকারি কর্মকর্তাকে রাজনৈতিক বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের সেবাদান করতে হয়। নব্য সরকারিকৃত এইসব কলেজ শিক্ষকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রাতারাতি পাল্টে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই এই বিচ্ছিন্ন জাতীয়করণ নয় ,বরং একটি সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নীতিমালার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ প্রয়োজন বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

ছয়।।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন অশিক্ষক আমলাদের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে শিক্ষা প্রশাসন ,নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ।অথচ শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়েছিল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে শিক্ষা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে। আমলাতন্ত্রের কূটকৌশলে , আমাদের সর্বগ্রাসী মনোভাবের কারণে শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টির চার দশক অতিক্রান্ত হলেও উপরিউক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

ক্যাডার মানে, একদল প্রশিক্ষিত মানুষ, যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের একটা অংশ ও মুখপাত্র হয়ে কাজ করে। সেই হিসেবে শিক্ষা ক্যাডারের কাজ শিক্ষা দান, শিক্ষা প্রশাসন চালানো, শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা সম্পর্কে ভাবা। এই সামগ্রিক কর্মসম্পাদনে যে উপযুক্ত আর্থিক প্রেরণা, অবকাঠামো, অনুপ্রেরণা প্রয়োজন, সেটা শিক্ষা ক্যাডারকে দেওয়া হচ্ছে না। এতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার মান পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ছে।

সাত।।

“অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ।”

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সংক্রামক ভাইরাসের মতো সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিচারব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষণীয় ।শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়ে

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৭৪ সালের প্রণীত ডঃ কুদরত- এ খোদা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে একটি উপযুক্ত শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর কয়েকটি আলোকিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

১. শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন।

২. সরকারি কর্মকমিশনের আওতা ব্যতীত সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের জন্য একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন গঠন।

৩. এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের বদলি ও পদায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

৪. সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার দিকটি পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন।

৫. সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দলভিত্তিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।

৬. প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ।

৭. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষক- কর্মকর্তাদের পদায়ন।

৮. শিক্ষকদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের মতো অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৯. সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি মানসম্পন্ন পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন।

প্রায় দেড় দশক পূর্ণ হওয়ার পরও শিক্ষা নীতির উপরিউক্ত নির্দেশনা গুলো আলোর মুখ দেখেনি। উপরিউক্ত নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল, যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন -এটাই বর্তমান সরকারের কাছে শিক্ষক সমাজ, শিক্ষার্থী ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যাশা।

যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে, ১৯৬২ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন উৎসর্গকারী বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহর রক্ত-শিখায় আলোকিত হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা- আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালিত সরকারের কাছে এটিই সমগ্র জাতির প্রত্যাশা।

মোঃ:জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ ,
সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ ,
০৫ অক্টোবর ২০২৩; আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস/ সুনামগঞ্জ।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা :রূপ ও রীতি /বিনয় মিত্র/ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন/২০১৪
২. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস/ড.মোঃ হান্নান /অন্যপ্রকাশ/২০০০
৩. বাংলাদেশের শিক্ষা: সমসাময়িক ভাবনা /গৌতম রায় (সম্পাদনা)/ শুদ্ধ স্বর/২০১৩
৪. শিক্ষা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিভাস/২০১৬
৫. শিক্ষা প্রসঙ্গ /বার্টান্ড রাসেল /শব্দগুচ্ছ (অনুবাদ)/২০১৪
৬. অত্যাচারিতের শিক্ষা /পাওলু ফ্রেইরি/আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া (অনুবাদ)/পাঠক সমাবেশ /২০১০
৭. প্রথম শিক্ষক/ চিঙ্গিস আইৎমাতভ/হায়াৎ মামুদ (অনুবাদ)/দ্যু প্রকাশন/২০১৬
৮. শিক্ষাবিজ্ঞান (রিসোর্সবুক)/ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/২০১৮
৯. দর্শন ও শিক্ষা/ শরিফা খাতুন/ মাওলা ব্রাদার্স /২০১৪
১০. বাঙালির শিক্ষা চিন্তা/ পরমেশ আচার্য/ দে'জ পাবলিশিং /২০১১